চরৈবেতি

সুব্রতা সেন

যে-কটি বৈদিকমন্ত্র আজকের দিনেও পরিচিতি হারায়নি তাদের মধ্যে 'চরৈবেতি' অন্যতম। ক্রমাগত এগিয়ে চলার এই মন্ত্রটি আছে ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। মন্ত্রটি বহুশ্রুত হলেও এর প্রেক্ষাপটের কাহিনিটি কিন্তু বহুজ্ঞাত নয়। অধ্যায় ৩৩-এর ছটি খণ্ড জুড়ে যে-কাহিনিটি পরিবেশিত হয়েছে তাতে সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি ও লোকচরিত্রের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় সর্বজনীন ও সর্বকালীন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গভীর সত্য। পাঠকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার বিষয় হল, দুটি ব্যাপার একই আখ্যায়িকার মধ্যেই গ্রথিত হওয়ায় ক্রমিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে রূঢ় বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আমাদের মননের আনন্দ বিঘ্নিত হয়।

আমরা সেজন্য আগে গল্পাংশটি সংক্ষেপে বলে তারপর দার্শনিক সত্যটির মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা দেখব এই তত্ত্ব কেবল সমকালেই নয়, যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্জগতে প্রবেশের দ্বার খুলে দিয়েছে।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র শত পত্নীর পতি হলেও পুত্রহীন। একবার তাঁর গৃহে নারদ ও পর্বতঋষি কয়েকদিনের জন্য বাস করেছিলেন। সেই অবসরে রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখা যায়, বিবেকী ও অবিবেক ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই পুত্রলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, কাজেই পুত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয় আমাকে বুঝিয়ে বলুন। পুত্রলাভের দ্বারা পিতা কীভাবে কতটা উপকৃত হন তা নারদ দশটি গাথার মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন। তারপর তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন—বরুণদেবতার কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন এবং একথাও বলুন, পুত্রলাভ হলে সেই পুত্র দ্বারা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করবেন।

এই মানসিকতা কোনও কোনও পৌরাণিক আখ্যানে (উদাহরণ *নরকবাস*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), এমনকী গত শতাব্দীতেও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের প্রথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বরুণদেবতার প্রসাদে পুত্র জন্মাল, নাম হল রোহিত।

জন্মের পর থেকেই বরুণদেব যজ্ঞের জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। রাজাও নানা কথা বলে কালহরণ করতে লাগলেন। শিশুর জাতাশৌচ কাটেনি, দাঁত ওঠেনি, তারপর দুধের দাঁত পড়ে নতুন দাঁত ওঠেনি, পশুর পরিবর্তে একে দিয়ে যজ্ঞ করা হলেও এ তো ক্ষত্রিয় সন্তান, সুতরাং ধনুর্বাণকবচাদি ধারণ ও ব্যবহার না শেখা পর্যন্ত সে

তো যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত হওয়ার যোগ্য হবে না। ক্রমে সেইকালও অতীত হল। আর তো অপেক্ষা করা চলে না! বাধ্য হয়ে রাজা করুণবচনে পুত্রকে ঘটনাটি বললেন। রাজপুত্র বড় হয়েছেন, এই ভয়ংকর ব্যাপার জেনে বাবাকে স্রেফ 'না' বলে দিয়ে ধনুর্বাণ হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে জলের দেবতা বরুণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য হরিশ্চন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে মহোদর বা উদরীরোগে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। পাঁচ বছর রোহিত বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। ষষ্ঠ বছরে আকস্মিকভাবে বনের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর দরিদ্র ব্রাহ্মণ অজীগর্তকে সপরিবারে দেখতে পেলেন। রোহিত বললেন—আমি আপনাকে একশো গোরু দিচ্ছি, তার বিনিময়ে আপনার একটি ছেলেকে দিন, যে আমার বদলে বরুণের যজ্ঞে মেধ্য হবে। অজীগর্ত তাঁর বড়ছেলে শুনঃপুচ্ছের হাত ধরে বললেন—এ আমার প্রিয়, একে আমি দিতে পারব না। মা ছোটছেলে শুনোলাঙ্গুলের হাত ধরে বললেন—এটি আমার প্রিয়, আমি একে কিছুতেই দিতে পারব না। বাকি রইল মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ। মাতাপিতা একমত হয়ে তাকেই দান করলেন। রোহিত শুনঃশেপকে একশো গোরুর দামে কিনে বাড়িতে এলেন, পিতাকে জানালেন—আমার বদলে শুনঃশেপকে দিয়ে বরুণের উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। ক্ষত্রিয়ের বদলে ব্রাহ্মণসন্তানকে মেধ্যরূপে পেয়ে বরুণ খুশি হলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে আদেশ দিলেন।

যজ্ঞে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি পৌরোহিত্য করতে এসেছেন। রাজসূয় যাগের আগে একাহ সোমযোগ করার নিয়ম। সেইসময় শুনঃশেপকে বলিদান করার উদ্দেশ্যে যূপে বন্ধন করতে হবে। এই নিষ্ঠুর কর্মে অধ্বর্যু নামক পুরোহিত কিছুতেই রাজি হলেন না, অপর কাউকেই একাজে পাওয়া গেল না। আশ্চর্যের বিষয়, শুনঃশেপের লোভাতুর পিতা আরও একশো গোরুর বিনিময়ে পুত্রের যূপবন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তখনও কোনও ক্রূরকর্মা ঘাতক পাওয়া গেল না দেখে অজীগর্ত আরও একশো গরু গ্রহণ করে পুত্রকে হত্যা করার জন্য অস্ত্রে শান দিয়ে এগিয়ে এলেন!

বেদনা ও বিস্ময়ে হতবাক শুনঃশেপ অনন্যোপায় হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে প্রজাপতি, অগ্নি, সবিতা, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও উষার স্তব করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে শুনঃশেপের বন্ধন খুলে যেতে লাগল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহোদর রোগও ভাল হয়ে গেল। দেবানুগৃহীত শুনঃশেপকে দিয়ে ঋষিরা তখন দিনের সমাপ্তিযাগের অনুষ্ঠান করালেন। এখন কে শুনঃশেপের পিতা বলে স্বীকৃত হবেন? এ-প্রশ্নের মীমাংসা পুত্রই করলেন। বালক বিশ্বামিত্রকে পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর কোলে এসে বসলেন। এতক্ষণে অজীগর্তের টনক নড়েছে। তিনি একবার বিশ্বামিত্রকে, একবার পুত্রকে মিনতি করতে লাগলেন যাতে শুনঃশেপ তাঁর কাছে ফিরে যান।

বিশ্বামিত্র বললেন—দেবতারা এ-পুত্র আমাকেই দিয়েছেন, একে আমি দেব না। আজ থেকে সে দেবরাত বৈশ্বামিত্র। শুনঃশেপ বললেন—খড়্গ নিয়ে আপনি আমাকে বধ করতে গিয়েছিলেন, এ সবাই দেখেছে। আমার প্রাণের বিনিময়ে আপনি তিনশো গাভীর দান বরণ করেছেন, এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে? অজীগর্ত নিজকৃত পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে ওই তিনশো গাভী পুত্রকে দিয়ে দিতে চাইলেন। শুনঃশেপের বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে, তিনি উত্তর দিলেন—যিনি শাস্ত্রবাক্যও উপেক্ষা করে একবার এই ভয়ংকর পাপ করেছেন তিনি অভ্যাসরূপে আবারও অন্য একটি পাপ করবেন। আপনার এই ক্রূর আচরণজনিত পাপ কোনওদিন মুছবে না।

বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ছিল, তিনি শুনঃশেপকে

জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা দিতে চাইলেন। প্রথম পঞ্চাশজন পিতার এই সিদ্ধান্ত মানলেন না, ফলে এঁরা বিশ্বামিত্রের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে অন্ধ্র, শবর, পুণ্ড্র, পুলিন্দা প্রভৃতি নীচ জাতিতে পরিগণিত হলেন এবং কালে এঁদের অনেকে দস্যু-তস্কররূপে কুখ্যাতি অর্জন করলেন। লক্ষণীয়, যাদের আমরা বর্তমানে আদিবাসী, উপজাতি গোষ্ঠীর লোক বলে থাকি তাদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠীই শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত আচার পালন করতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে নিম্নবর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে। (তুলনীয় মনুসংহিতা ৪৩, ৪৪) পরের পঞ্চাশপুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বামিত্রের অশেষ আশীর্বচন ও বরলাভ করে ধন্য হলেন। এই হল গল্পকথা।

এই গল্পে কয়েকটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই জানেন, প্রাচীন পৃথিবীর সকল দেশে সভ্যতার শুরু হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দিয়ে। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ পরিবারে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করেন। স্থাবর সম্পত্তিতে তো বটেই, পরিবারের সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই পিতৃপ্রভু (patriarch)। তাঁর প্রভুত্বের শক্তিতেই পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় থাকে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বৈদিক সাহিত্যে একদিকে যেমন patriarch-এর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের নজির আছে, তেমনই রয়েছে তাঁর ক্ষমতা-সংকোচনের উদাহরণ। এই ছোট গল্পটিতে অজীগর্তের ইচ্ছামতো সন্তানকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করার মধ্যে পিতৃপ্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আবার প্রাণরক্ষার তাগিদে রোহিত পিতার প্রস্তাবে সরাসরি 'না' বলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। ঋগ্‌বেদে (১।১১৬। ১৬) বলা হয়েছে একশো মেষকে খাদে ফেলে দেওয়ার অপরাধে ঋজ্রস্ব-র পিতা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। যারা পিতৃপ্রভুত্বের প্রবক্তা তারা প্রায়শ শুনঃশেপের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কী যুক্তিতে এই চূড়ান্ত প্রভুত্ব মানা যায়? এর উত্তর হল—যেহেতু পিতামাতা সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন সুতরাং তাঁরা তাকে দান, বিক্রয়, পরিত্যাগ করতে পারেন (তস্য প্রদানবিক্রয়ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১৫। ১,২)। পিতার তাই পুত্রের উপর আধিপত্য আছে। (পিতা পুত্রস্যেশে, কাঠকসংহিতা, ১১।৪) কালের পরিবর্তনে পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মূল পিতৃপ্রভুর মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে পরিবারের অন্য সদস্যদের কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃত হল। সেই তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারী হলেন পুত্র, প্রধানত জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি পিতার ঐহিক ও পারত্রিক সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে থাকেন।

হরিশ্চন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে নারদ পুত্রের মহিমা বিশেষরূপে বর্ণনা করেছেন যা উত্তরকালেও পুত্রের বিশেষত জ্যেষ্ঠপুত্রের দাবি ও অধিকারের সপক্ষে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। গল্পে অজীগর্তের যে-পরিচয় পাই তাতে জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা নিঃস্বার্থ কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। পরের যুগে কিন্তু সন্তানকে দান বা বিক্রি করার অধিকার শাস্ত্রে অস্বীকৃত হয়েছে। (দানং ক্রয়ধর্মশ্চাপত্যস্য ন বিদ্যতে, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।৬।১৩।১০)

সমকালীন সমাজের এই নিষ্ঠুর বৃত্তান্তের ঠিক মাঝখানে এগিয়ে চলার মন্ত্রটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। সে যেন আমাদের কর্ণমূলে কেবলই শোনাচ্ছে—এই দ্বন্দ্বের জগতে একরূপতা নেই, ক্রমাগত দৃশ্যপটের পরিবর্তনেই চলে বৈচিত্র্যের লীলা। সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই বদ্ধ থাকে। নিজস্ব ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার নিরিখে সুখ-দুঃখ ভোগ করে কেবলই আন্দোলিত হতে থাকে। লীলারস আস্বাদনের অবসর পায় না। তাই চরৈবেতি মন্ত্রটি যেন বলছে, কোথাও আটকে থেকো না, না সুখে না দুঃখে। নাটকের দ্রষ্টার মতো

লীলারস পান করতে করতে ক্রমাগত এগিয়ে চলো।

গল্পে আমরা দেখেছি, বরুণের যজ্ঞে তাঁকে বলিদান করা হবে শুনে রোহিত গৃহত্যাগ করেছিলেন। একবছর তিনি বনে বনে ঘুরলেন। এর মধ্যে তাঁর কানে পৌঁছল, বরুণের অভিশাপে পিতা উদরীরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বভাবতই তিনি বাবাকে দেখার জন্য বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। মাঝপথে দেবরাজ ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাড়ি যেতে নিষেধ করে বললেন—রোহিত, আমরা বিজ্ঞব্যক্তিদের কাছে শুনেছি, পথ চলতে চলতে যিনি পরিশ্রান্ত তিনিই নানা শ্রী লাভ করেন, মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা যদি (স্বজনের সঙ্গে) ঘরে বসে থাকেন তাহলে তাঁরাও নিম্নমানের হয়ে যান। যে চলে সে একা চলে না, স্বয়ং ইন্দ্র তার সখারূপে সঙ্গে সঙ্গে চলেন। অতএব তুমি চলো, চলতে থাকো। ''নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।/ পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি চরৈবেতি॥''

ব্রাহ্মণবাক্য শিরোধার্য করে রোহিত আবার বনের পথেই চলতে লাগলেন। বছর ঘুরে গেল, ক্লান্ত রোহিত ঘরের দিকে ফিরলেন। আবার সেই ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা। রোহিতকে চলার পথে উৎসাহিত করার জন্য ব্রাহ্মণ বললেন—যে নিত্যই চলে তার জঙ্ঘা পুষ্পিত হয়ে ওঠে (সৌষ্ঠবযুক্ত ও সহিষ্ণু হয়), আত্মা—যাঁর স্বভাবই আপন মহিমায় প্রকাশিত হওয়া—সকল বাধা ঠেলে নিত্যই হয়ে উঠতে থাকেন। (আত্মা মানে অহংবোধ ধরলে, তা নীরোগ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে।) চলিষ্ণু ব্যক্তির সকল পাপ (অজ্ঞান) চলার শ্রমে অভিভূত হয়ে প্রপথে অর্থাৎ মুক্তপথের উপর শয়ন করে। অতএব রোহিত, চলো, এগিয়ে চলো। ''পুষ্পিণ্যৌ চরতে জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।/ শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতশ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥''

রোহিতকে অরণ্যের মুক্তপথে ফিরতে হল। আবার এক বছর কেটে গেল, এবার বাড়ি ফিরবেনই মনস্থ করে শ্রান্ত রোহিত সেদিকেই ফিরলেন। হায় কী দুর্ভাগ্য! আবার সেই ব্রাহ্মণ পথে দাঁড়িয়ে! তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন, ক্লান্ত রোহিত এবার বিশ্রাম চায়। তাই তিনি বললেন—যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও দাঁড়িয়ে ওঠে, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্য শুয়েই পড়ে। যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও তার সঙ্গে চলে এগিয়ে। অতএব রোহিত চলো, এগিয়ে চলো। ''আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।/ শেতে নিপদ্য-মানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥''

নিরুপায় রোহিতকে আবার অরণ্যের পথে এগোতে হল। একবছর পর গৃহাভিমুখে ফিরতেই আবার সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা! রোহিত জানেন, তিনি আবার তাঁকে চলতে বলবেন। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল মুক্তপথে অন্তহীন বিচরণের এই সাধন হয়ত সত্যযুগে চলত, এখন এর কী প্রাসঙ্গিকতা আছে? রোহিতের যুগবিভাগের হিসেব সব গোলমাল হয়ে গেল যখন ব্রাহ্মণ বললেন—শুয়ে থাকলেই কলিকাল, জেগে উঠলে দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালে ত্রেতা আর সামনে এগিয়ে চললেই সত্যযুগ—''কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।/ উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥''

এই মন্ত্রভাষ্যে সায়ণ বলেছেন—এইগুলি বস্তুতপক্ষে মানুষের জীবদ্দশারই চারটি অবস্থা। নিদ্রা, জাগরণ, উত্থান আর সঞ্চরণ বা চলা—এই অবস্থাগুলির মধ্যে পরেরটি আগেরটির চেয়ে ভাল। কাজেই নিদ্রা হল কলি, জেগে ওঠা দ্বাপর, উঠে পড়া ত্রেতা আর চলতে থাকাই কৃত বা সত্যযুগ। অতএব ব্রাহ্মণের উপদেশ—রোহিত চলো, চলতে থাকো। অগত্যা রোহিতকে আবার চলতেই হল।

আরও একবছর গেল চলার পথে পথে। রোহিত বড় ক্লান্ত, এবার বাড়ি যেতেই হবে। বাড়ির পথে আসতেই কী সর্বনাশ! সেই ব্রাহ্মণের পুনরাবির্ভাব। রোহিত বুঝেছেন আবারও তিনি চলতে বলবেন। রোহিত হয়তো ভাবছেন, মুক্তপথে এইরকম নিত্যসঞ্চরণ করে লাভই বা কী? তাঁর মনের কথাটা যেন পড়ে ফেলেই সেই ব্রাহ্মণ বললেন—সঞ্চরমাণ পুরুষই পায় মধু, পায় সুস্বাদু উদুম্বর। (সায়ণ বলেছেন—এ-মধু সামান্য মধু নয়। এ হল মোক্ষামৃত।) চেয়ে দেখো সূর্যকে। কবে থেকে সমগ্র আকাশ নিত্যপরিক্রমা করেও এতটুকু তন্দ্রাবিষ্ট হয়নি কখনও। এজন্যই তার শ্রেষ্ঠত্ব, এখানেই তার মহিমা। কী নিরলস চলিষ্ণু এই নিত্যপথিক! অতএব চলো রোহিত, নিত্যই চলো, চলতেই থাকো—''চরন্ বৈ মধু বিন্দতে চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।/ সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥''

এই চলার প্রেরণা, মুক্তপথের সাদর আহ্বান যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই প্রথম দেখা গেছে তা নয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০৯।৫) রয়েছে পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীর কথা—''ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ।'' অথর্ববেদের ব্রহ্মচারী শুধু নিজে চলেন তাই নয়, আপন চলিষ্ণুতায় তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককেও করেন সঞ্চালিত—ব্রহ্মচারীষ্ণং চরতি রোদসী উভে (১১।৭।১)। মানুষের কাছে সুদূর অতীত থেকেই অনলস চলার প্রেরণা হল একর্ষি সূর্য। বাজসনেয়ী সংহিতায় (২৩। ৪৫, ৪৬) যজ্ঞের অবসরে হোতা অধ্বর্যুকে জিজ্ঞাসা করছেন—কে একাকী চলেন? কে বারে বারে জন্মান? অধ্বর্যু উত্তর দিচ্ছেন—সূর্য একাকী চলেন, চন্দ্রমা বারে বারে জন্মান—''সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।'' অনপেক্ষ সূর্য কারও সাহায্যের দিকে না তাকিয়ে চলার পথে ঘুমভাঙানিয়া আলোকস্পর্শে সস্নেহে জাগিয়ে তোলেন সমগ্র সৃষ্টিকে, কর্মে প্রেরণা দেন সকল জীবকে আর প্রোজ্জ্বল করে তোলেন মানুষের ধীশক্তিকে। তাঁর সেই বরেণ্য ভর্গই চরণশীল ব্রহ্মচারীকে প্রদান করে দ্যুলোক ও ভূলোকের পরিচালনশক্তি।

সতত পরিবর্তনের ছন্দে আবর্তিত পৃথিবীর এই সচল রঙ্গমঞ্চে নিত্যসঞ্চরণের বিধান কিন্তু অপরিবর্তিত। সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও সাধকগণ পরিব্রাজনের মাধ্যমেই অপরা ও পরাজ্ঞানের সাধনা পূর্ণ করে আসছেন। সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার ছাত্রগণ শিক্ষাশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে প্রাজ্ঞজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্ঞানের ও ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্জিত বিদ্যা দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে তবে গৃহে ফিরতেন। আধুনিক যুগেও পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে মত ও ভাবের বিনিময়-প্রয়াসের মধ্যে একইরকম মানসিকতা লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় পরিব্রাজন তো চিরাচরিত সর্বজনীন পন্থা। সপার্ষদ ভগবান বুদ্ধ বর্ষাকালের চাতুর্মাস্য ছাড়া সর্বদাই পর্যটন করতেন। এই পথ চলা কেবল নিজেদের মঙ্গলের জন্যই নয়, সকলের কল্যাণের জন্যও বটে। বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য পরিব্রাজন করো—''চরথ ভিক্খবে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।'' ক্রমাগত ভ্রমণের মাধ্যমেই বৌদ্ধ ও জৈন সাধকগণ সদ্ধর্ম প্রচার করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁদের সর্বদা অনাগারিক, অনিকেত অর্থাৎ (নির্দিষ্ট) গৃহহীন হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহাভারত, ভাগবতও সাধকদের পরিব্রাজকরূপে বর্ণনা করেছেন। এই পরিব্রাজকরা কিন্তু চঞ্চলচিত্ত উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে নন। এঁরা ইষ্টকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, চলার পথই তাঁদের সাধনপথ। একাগ্রচিত্তে সেই প্রেমাস্পদকে চিন্তা করতে করতে

তাঁর সঙ্গেই তাঁরা পথ চলছেন। এই অনিকেত চলিষ্ণু ভক্তকে ভগবান কি একলা ছেড়ে দিতে পারেন? তিনি যে প্রভুর আপনজন! গীতায় ভগবান স্বমুখে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন—''অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।''

এই চলার বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী? কবীরজী বললেন—জল প্রবাহিত হলেই নির্মল থাকে, বদ্ধজল হয় দুর্গন্ধময়। ক্রমাগত এগিয়ে চলা সাধককে কোনও মালিন্যই স্পর্শ করতে পারে না—''বহতা পানী নির্মলা বন্ধা গঁধীলা হোয়/ সাধক তো চলতা ভলা দাগ লগৈ ন কোয়।'' A rolling stone gathers no moss—এ তো সর্বজনীন অনুভব।

মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলন ও বিভিন্ন ধর্মের মরমিয়া সাধকদের প্রেমময় জীবন ও বাণী যে সমকালে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও ক্লেশের হাত থেকে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছিল তা তাঁদের চলিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতার বলেই।

দশম-একাদশ শতকেও ভারতীয় যোগী ও নাথপন্থী সাধুরা আরব, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে পরিব্রাজনে যেতেন। এমনই একটি ভারতীয় দলের সঙ্গে বাগদাদে সিরিয়ার দৃষ্টিহীন সাধক কবি আবুল আলার পরিচয় হয়। আবুল ছিলেন স্বাধীনচিত্ত, উদার ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। এই পরিচয়ের ফলে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। অহিংসা ও নির্বাণ মুক্তি তাঁর গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাগদাদ থেকে দেশে ফিরে তিনি ভারতীয় সাধকদের মতো একটি গুহায় বাস করে তপস্যা করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর জীবন আনন্দ আর শান্তিতে ভরে উঠল যার প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর তৎকালে রচিত কাব্যগুলিতে। আবুল আলার মতবাদ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। পরবর্তী সুফি সাধকদের মতাদর্শে ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রভাব স্থান করে নিয়েছে। প্রখ্যাত মরমি কবি জালালউদ্দিন রূমীর (১২০৭ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে ভারতীয় ভাব। জন্মান্তরের মাধ্যমে ক্রমোন্নতি স্বীকার করে রূমী বলছেন—ছিলাম পাষাণ, মরে হলাম বৃক্ষলতা, ছিলাম উদ্ভিদ, মরে হলাম জন্তু। ছিলাম জন্তু, মরে হলাম মানুষ, পরে আমি হব অমরলোকবাসী, তারপর অনুপম গতি লাভ করে আমি হব শূন্য।

স্পষ্টতই এখানে নির্বাণের ভাব ফুটে উঠেছে। আবার ঋগ্‌বেদের বাগাম্ভৃণীর মতো বলছেন—সূর্যের রশ্মির মধ্যে ভাস্বর রেণুকণারূপে আমিই ভাসমান, সূর্যের তেজোময় গোলকরূপে আমিই দীপ্যমান। আমিই উষার প্রথম জ্যোতিলেখা, আমিই সন্ধ্যার শান্তপ্রাণ সমীরণ।

''দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে''—এই অনুপম ভাবমাধুর্য যুগে যুগে ভারতীয় সন্ত-মহাত্মাদের চলিষ্ণু জীবনকে মধুময় করেছে, তাঁদের সাধনপথে সঞ্চারিত করেছে নতুন সংবেগ যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমৃদ্ধ করেছে সকল মানুষকে। কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ধনীর দুলাল ধর্মদাস চলার পথেই পেলেন কবীরজীর সংস্পর্শ। গভীর কৃতজ্ঞতায় ধর্মদাস বললেন, পথ চলতে চলতে মিলে গেলেন সদ্‌গুরু। অনির্বচনীয় সেই আনন্দ!—''রাহ চলত মোহি মিলি গয়ে সত্‌গুরু।/ সো সুখ বরণি না যায়।''

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঝাড়খণ্ডের পথে চললেন বৃন্দাবন পরিক্রমায়। তাঁর কৃপায় পথ খুঁজে পেল আদিবাসী সাধারণ মানুষ। তাঁর নির্দেশে রূপ, সনাতন প্রমুখ শিষ্য পথে পথে ঘুরে অসম্ভব পরিশ্রম করে উদ্ধার করলেন বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলি।

এই চরৈবেতি মন্ত্রের আহ্বান আজও ডাক দিয়ে যায় অধ্যাত্মপথিকদের। শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যতনুত্যাগের পরে স্বামী বিবেকানন্দ সহ তাঁর প্রায় সকল পার্ষদ সন্তান বেরিয়েছেন ভারত

পরিক্রমায়। রাজপ্রাসাদ থেকে অকিঞ্চনের কুটিরে পর্যন্ত নির্বিচারে বিচরণ করে তাঁরা অনুভব করেছেন, ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি স্পন্দিত হচ্ছে তার গভীর ধর্মচেতনায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের ব্যাপক পরিব্রাজন কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা, তিতিক্ষা ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটিয়েছে তা সকলের জানা। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ মনীষা ও উদার প্রেমশক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ মূল্যায়ন ও মিলনের উপায় নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে উভয়দেশে অক্লান্ত পরিভ্রমণের ফলে।

এই যে অবিশ্রান্ত চলার আহ্বান ক্রমাগত ধ্বনিত হয়েছে সেই সুদূর অতীত থেকে, তা কি শুধু বাইরের চলা? অভীষ্টসিদ্ধিতে সাধকের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হয় অনাস্বাদিতপূর্ব গভীর রসোল্লাস। পরমপ্রেমিক আধিকারিক পুরুষের প্রাণে সেই পরমানন্দ ভাগ করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণের পর্যবেক্ষণে—কুয়ো খুঁড়বার পর কেউ ঝুড়ি-কোদাল কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়, আর কী দরকার? কেউ বা তুলে রাখে যদি আর কারও দরকার হয়। কেউ কেউ আম খেয়ে মুখ মোছে, কেউ বা অন্যকে দিয়ে খায়। প্রায়ই দেখা যায় সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর সন্ত-মহাত্মাগণ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন, উপযুক্ত শুশ্রূষু আধার খুঁজে ফেরেন, নিজের ভাবের, প্রাপ্তির কিছুটা অন্তত বিতরণ না করলে তাঁদের স্বস্তি হয় না। বোধিলাভের পর ভগবান বুদ্ধ যেমন তাঁর উপলব্ধ সম্পদ যোগ্যপাত্রে দান করার জন্য সমুৎসুক হয়েছিলেন, তেমনই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অতুলনীয় ভাবসম্পদ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে ব্যাকুলহৃদয়ে ডাকতেন—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!

প্রবর্তক সাধকদের মধ্যেও দেখা যায় পরিব্রাজনের আগ্রহ। এঁরা বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। দেখার, শোনার, সাধুসঙ্গে মেশার ও জানার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলে তারপর চুপ করে এক জায়গায় আসন করে বসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনায় সাধু দুরকম। বহূদক আর কুটিচক। বহুতীর্থের উদক অর্থাৎ জলপান করে যারা বেড়ায় তাদের বলে বহূদক—এখনও এদের ভেতরটা শান্ত হয়নি। শান্ত হলে মানুষ আর নড়ে না, এক জায়গায় চুপ করে বসে (অর্থাৎ বসে সাধনা করে)। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা পাখির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সে-পাখি আনমনা হয়ে জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল। জাহাজ যখন সমুদ্রে পড়ল তখন তার চটকা ভাঙল। সে একে একে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে উড়ে গেল, কোনওদিকে কূলকিনারা দেখতে না পেয়ে শেষে আবার মাস্তুলেই এসে বসল, তখন একেবারে নিশ্চেষ্ট। বাইরে যে কোথাও কিছু নেই, অস্থিরতা বাদ দিয়ে সদ্‌গুরুর নির্দেশে সাধনা করলে একস্থানে বসেই যে নিজের অন্তঃপুরে বস্তুলাভ সম্ভব—এই সারকথাটুকু উপলব্ধি করার জন্যও পর্যটনের প্রয়োজন আছে। ডানা ব্যথা না হলে পাখি তো স্থির হয়ে মাস্তুলে বসে না! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নানা তীর্থ ভ্রমণ করে দক্ষিণেশ্বরে এসে বলছেন—দেখলাম, কোথাও দু আনা, কোথাও চার আনা, কোথাও বড় জোর আট আনা,—এখানেই ষোলো আনা পেলাম।

বাইরের ঘোরাঘুরি শেষ করে কুটিচক এক জায়গায় চুপ করে বসেন বটে, তাঁর চলা কিন্তু থামে না। ঈশ্বর যেহেতু অসীম ও অনন্ত, তাই যতই সাধনা করা হোক না কেন অহংবোধে সীমিত মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই তাঁর সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। কেমন করে তাঁকে তবে পাওয়া যায়? নিজের অহংকে বিনাশ করে তাঁর মধ্যে মিশে যাওয়া ছাড়া তাঁকে পাওয়ার আর উপায় নেই। নদীকে যেমন সাগরকে পেতে গেলে নিজেকে তার মধ্যে বিলীন করে দিতে হয়। মূল অবিদ্যা, আমি ও আমার বোধ মানুষের মধ্যে এত দৃঢ় যে অহং-এর বিনাশের

সম্ভাবনামাত্রেই সে মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এই মহাসত্যই তুলে ধরা হয়েছে যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন ভীরুর জন্য নয়। অভীঃ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বীরই কেবল বিস্তর বাধাযুক্ত ক্ষুরের ধারার মতো শাণিত পথ অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখেন। দাদূ বলেন—পিছনের ডাকে যেন পিছনে যেয়ো না। ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে চলো, সামনেই বিরাজিত আমার অনুপম। পিছনের তো কোনও আকর্ষণই নেই—''পীছৈঁ হেলা জিনি করৈ আগৈঁ হেলা আব/ আগৈঁ এক অনূপ হৈ নহিঁ পীছৈঁ কা ভাব।''

দাদূ নিত্য অগ্রসর হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে রাজি। কারণ এইভাবে মরণকে স্বীকার না করলে যে-জীবন তা মৃত্যুরও অধম। সব জীবন সঙ্গে নিয়ে দাদূ মরতেই চললেন। মরে দেখলেন মূল ও লাভ দুই-ই হল করায়ত্ত—''দাদূ মরণে কৌ চলা সব জীবনকে সাথি/ দাদূ লাহা মূল সৌঁ দুন্যোঁ আয়ে হাথি।''

কবীরও বললেন—এই মাথা যদি বাঁচাতে যাও তবেই যায় মাথা, আর তাঁর জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে যদি শির যায় তবেই থাকে আমার প্রাণ—''শির রাখৈ শির জাত হৈ শির কাটৈ শির হোয়।''

এযুগে স্বামী বিবেকানন্দও বললেন, ''আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া।''

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা কাঠুরের গল্পে আমরা পাই 'চরৈবেতি'র বাংলা—এগিয়ে পড়ো। কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে যায়। একদিন এক ব্রহ্মচারী তাকে বলেন—ওহে এগিয়ে পড়ো। তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করে সে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে পেল চন্দন কাঠ, আরও এগিয়ে পেল রূপোর খনি। ব্রহ্মচারীর মর্যাদা রক্ষা করে সে কিন্তু চলা থামাল না। এগোতে এগোতে ক্রমে পেল সোনার খনি, রাশীকৃত হীরেমাণিক। তখন তার কুবেরের মতো ঐশ্বর্য হল। গল্পটি বলে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ করলেন—''তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিস পাবে। একটু জপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে।... আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ, কথাবার্তা হবে।''

কাঠুরের গল্প থেকে বোঝা গেল, অধ্যাত্মসাধনার প্রথম শর্ত গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস, দ্বিতীয় শর্ত তাঁর নির্দেশ নিষ্ঠাভরে যথাযথ পালন করা, আলস্য ও শৈথিল্য বর্জন করে ইষ্টলাভের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সাধনায় লেগে থাকা। অবশ্যই চাই ইষ্টের প্রতি অনুরাগ ও ব্যাকুলতা। হীরেমাণিকের মূল্য বুঝলে তবেই তো মানুষ ব্যাকুলচিত্তে তপস্যার শ্রম স্বীকার করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায় কামিনী কাঞ্চন তুচ্ছ বলে বোধ হয়।'' তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নামগুণ সর্বদা কীর্তন করলে তাঁর উপর ভালবাসা ক্রমে হয়। যথার্থ ভালবাসা এলে জগৎ ভুল হয়, নিজের দেহ যে এমন প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। পূর্ণ প্রেমে সাধক দেখে, আমার প্রেম তাঁর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর প্রেমও আমার প্রেম ছাড়া অপূর্ণ।

কবীর বলছেন—তিনি অসীম ধৈর্যে আমার জীবনমন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার সেই ভিখারির করুণনয়ন দুটি যদি চেয়ে দেখ, তবে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারি হতে হবে। দেখ, আমার ফকির আজ আমাকেই ভিক্ষা করে উদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে-সুর গিয়ে বেজেছে।

অনন্ত, অসীম সেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে অন্তহীন চলার আহ্বান যুগ যুগ ধরে কেবলই ধ্বনিত হচ্ছে—'চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি'—যে শোনে, সে কি না চলে থাকতে পারে?